Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual-Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-1 July 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

অন্য জীবনানন্দ

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

Link : 2. https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/07/2_Chandramalli-Sengupota.pdf

সারসংক্ষেপ: প্রথাগতভাবে জীবনানন্দ দাশকে নিরাশার, নির্জনতার কবি বলা হয়। আলোচনাতেও কয়েকটি বিষয়গত ভাগে তাঁর কবিতাকে ভাগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু জীবনানন্দ হয়ত সচেতন ভাবেই তাঁর ওপর প্রোথিত তকমাটিকে সরিয়ে অন্য কিছু লেখার কথা ভেবে এই বহুচর্চিত বিষয়গুলির বাইরে বেরিয়েও লিখেছেন। তাঁর কবিতায় মনস্তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই মনের জটিল বিন্যাস নানা ভাবে কবিতায় রূপ পেয়েছে। নিজের অবচেতনকেই মেলে ধরেছেন অকপটে পরাবাস্তব কবিতাগুলিতে ভাবনার আবডালে। অন্যদিকে আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা কবি জানতেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে দু-একজন বহুকে বঞ্চিত করে সব দখল করে নেয়। সেই বোধ তাঁকেও সমকাল ও বাস্তবের কঠিন জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল। তবু তিনি বিশ্বাস করেছেন মানুষ নিজেদের দুর্দশার অন্ধকার পেরিয়ে শত খামতির মধ্যেও নতুন প্রাণকণা হয়ে জেগে উঠবে।

সূচক শব্দ: মনস্তত্ত্ব, পরাবাস্তবতা, সমাজ জিজ্ঞাসা, অন্ধকার, নতুন প্রাণকণা, অন্য জীবনানন্দ

মুখপাত

জীবনানন্দ দাশ ১২৫ বছর পূর্ণ করলেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের সবচেয়ে নন্দিত ও আলোচিত এই কবির জীবদ্দশায় প্রায় কোনো খ্যাতি বা পরিচিতি না জুটলেও তাঁর অনন্য সৃষ্টিশীল সত্তাকে পাঠককুল পরবর্তীকালে চিনে নিতে পেরেছে। আমার ছাত্রজীবনেও রবীন্দ্রনাথের পাশে যাঁদের কবিতা পড়তে ভাল লাগত তাঁদের অন্যতম ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। অবশ্য এর নেপথ্যে একটা মজার কারণও ছিল : জীবনানন্দ আসলে দাশগুপ্ত, তাই তাঁর কাব্যপ্রতিমার নাম বনলতা সেন, অর্থাৎ বৈদ্যদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার নজির এখানেও, এমন ইয়ার্কি শোনা যেতো। এদিকে আমিও সেনগুপ্ত, তাই বেশ একটা আপন লাগত। কিন্তু পাঠক হিসেবে প্রথম খটকা লাগল যখন শুনলাম তাঁকে নিরাশার, নির্জনতার কবি বলা হয়। তাঁর দারিদ্র্যের জীবন, অসুখী বৈবাহিক জীবন, ট্রামের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু... সবটা মিলিয়ে সত্যিই তো জীবনটা বেদনারই, যে জীবনের অনেকটাই তাঁর উপন্যাসগুলিতে ফুটে উঠেছে।

জীবনানন্দ সম্পর্কে যে-কোনো আলোচনায় সাধারণভাবে বিষয়ের দিক থেকে কয়েকটি ভাগে তাঁর কবিতাকে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা প্রকৃতিচেতনা, সৌন্দর্য ও প্রেমচেতনা, মৃত্যুচেতনা, ইতিহাসচেতনা সমাজচেতনা, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে প্রকৃতি, সৌন্দর্য, প্রেম, মৃত্যু, ইতিহাস অনেক সময়েই মিলেমিশে গেছে বহু কবিতায়। তাই বিষয়গত ভাবে সবসময় যে কবিতাগুলিকে আলাদা করা যায় এমন নয়। এমনকি কালানুক্রমও ধরা যায় না অনেক সময়। এই amalgamation তথা সংমিশ্রণ নিয়েই আলোচনাও হয় বেশি। কিন্তু বক্ষ্যমান প্রবন্ধের লক্ষ্য অন্য এক জীবনানন্দকে নিয়ে কথা বলার, যিনি এই বহুচর্চিত বিষয়গুলির বাইরে বেরিয়ে অন্য কিছু নিয়েও লিখেছেন। নির্বাচিত কয়েকটি কবিতার আলোচনা করার নিরিখে সেই অন্য-জীবনানন্দকে হয়ত খানিকটা ছোঁয়ার প্রয়াস থাকবে পরবর্তী অংশগুলিতে।

১

বুদ্ধদেব বসু যাঁকে নির্জনতার কবি বলেছেন, তাঁর কবিতায় মনস্তত্ত্ব যে একটি বিষয় হয়ে উঠবে তা তো স্বাভাবিক। কবির সেই নির্জন মনের গহন থেকে উৎসারিত হলো যেসব কবিতা, তাদের মধ্যে 'আট বছর আগের একদিন' ও 'বোধ' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

এবং পরিচিত যদিও 'বোধ' আগে লেখা ('ধূসর পাণ্ডুলিপি', ১৯৩৬) তবু পড়ার সময় সেটি 'আট বছর আগের একদিন' ('মহাপৃথিবী', ১৯৪৪) কবিতার পরে পড়লে ভাবনাসূত্রটি তথা thought processটিকে চিহ্নিত করা সহজ হয়। যুক্তিটা এরকম যে দ্বিতীয় কবিতায় আটবছর পরে হঠাৎ যে লোকটি মরতে গেল, ঠিক আট বছর আগে লেখা 'বোধ' কবিতায় তার পূর্ব সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আর দুয়ে মিলে যেন একটি মানুষের জীবনের কাহিনিকে ব্যক্ত করে।

দ্বিতীয় কবিতাটি লেখার সময় জীবনানন্দের লেখা চিঠিপত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রবল অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ফুটে উঠেছে। সংসারের প্রতি দায়িত্বপালনে প্রায় অপারগ কবি মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন। সেই যন্ত্রণাবোধ তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বাইরের জগৎ থেকে। আত্মমগ্ন সেই অস্থির হৃদয় প্রকাশ পেয়েছে দ্বিতীয় কবিতায়।

ফাল্গুনের এক রাতে এই কবিতার মানুষটার পাশে স্ত্রী ও সন্তান শুয়েছিল... তবু হঠাৎ করে তার ঘুম ভেঙে গেল আর সে আত্মহত্যা করল। কবিতাটি শুরু হয় মেডিকেল কলেজের প্রায় অন্ধকার লাশকাটা ঘরে বা মর্গে, যেখানে লোকটি শুয়ে আছে। সে প্রণয়ে ব্যর্থ হয়নি, বিবাহিত জীবনের পূর্ণ স্বাদ সে পেয়েছে, স্বচ্ছল তার যাপন। তবু জীবনের এত স্বাদ তার পছন্দ হলো না, তাই সে আজ লাশকাটা ঘরে শুয়ে আছে, কারণ সেই রাতে সে না জানি কোন্ 'ভূত' দেখেছিল। এই ভূত কি তার মনের অজানা melancholy যা গত আট বছর ধরে তাকে ক্লিষ্ট করেছে সব প্রাপ্তির পরেও? আমরা তো জানি ভূত মানে অতীতও।

তাই এবারে চলে যাওয়া যাক ৮ বছর আগে লেখা 'বোধ' কবিতাটিতে, যেখানে কবি লিখেছেন 'মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয় — প্রেম নয় — কোনো এক বোধ কাজ করে', যে বোধ শান্তি দেয় না, বরং সব কাজ তুচ্ছ, পণ্ড মনে হয়, সবকিছুই শূন্য মনে হয়। এই কবিতার মানুষটি মেয়েমানুষকে ভালবেসেছে, অবহেলা করেছে, ঘৃণা করেছে, নিজেও ভালবাসা পাওয়ার পাশে উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হয়েছে। সে জানে এখন আর সহজ ভাবে চলতে কী কথা বলতে কেউ পারে না। শরীরে মাটির গন্ধ মেখে আলোর দিকে চেয়ে কেউ আর আশা করে জীবনও কাটায় না। কিন্তু এমন ঘোরপ্যাঁচের পৃথিবীতেও সে মাঠে গিয়ে চাষার মতো লাঙল তুলেছে, কাস্তে ধরেছে হাতে, জেলেদের মতো জলে নেমে গায়ে কাদা, পাঁক, শ্যাওলা মেখেছে। কিন্তু তাও সে দেখেছে 'সকল লোকের মাঝে' সে কেমন একলা হয়ে গেছে, হয়ত তার 'মুদ্রাদোষে'। এই মুদ্রাদোষটি কি — বারবার তার নিজের হৃদয়ের কাছে, ওই একাকীত্ব, ওই বিচ্ছিন্নতার কাছে ফিরে যাওয়া? তবে এই যে বোধটি তাকে ক্লিষ্ট করেছে, তা তাকে নিয়ে গেছে খোলা প্রান্তরে, নক্ষত্রের নীচে সে শুয়ে থেকেছে আর ভেবেছে কোনো একদিন নিশ্চয়ই সে শান্তির খোঁজ পাবে, আর এই পৃথিবীতেই নিজস্ব মানুষীর আর শিশুর মুখ দেখে আহ্লাদও পাবে। তারপর সে ঘুমোবেও।

এরপর কেটে গেছে ৮টি বছর। তার জীবনে বধূ এসেছে, এসেছে সন্তান, অতীতের সব না-পাওয়াগুলো সফল হয়েছে। কিন্তু ফাল্গুনের রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সে আবার সেই ৮ বছর আগের 'ভূত'টাকে দেখতে পেল, অর্থাৎ আবার তার মাথার ভেতর ফিরে এল সেই 'বোধ', সেই বিপন্ন এক বিস্ময়, যা অন্তর্গত রক্তের ভেতরে বহমান, যা তাকে ক্লান্ত করে তোলে। সে বুঝতে পারল এবারে সময় হয়েছে ঘুমোবার। বাইরে তখন চাঁদ ডুবে গিয়েছিল; উট যেমন করে গলা বাড়িয়ে তাঁবুর প্রায় সবটাই দখল করে নেয়, ঠিক তেমন ভাবেই একটা অস্বস্তিকর নৈঃশব্দে ভরে গিয়েছিল পৃথিবী। এমন সময় সে একগাছা দড়ি নিয়ে অশ্বত্থের ডালে ঝুলে পড়ল। তারপর লাশকাটা ঘরে তার মৃতদেহ ইঁদুরগুলো কামড়ে দিয়ে রক্তমাখা মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সে শুয়ে আছে, জন্মের ঘুম ঘুমোচ্ছে। আর তাকে জাগতে হবে না, অজানা কোনো গাঢ় বেদনার অবিরাম ভার সইতে হবে না।

কিন্তু তার জীবনের গল্পের এই পরিণতি মোটেও কবির পছন্দ হয়নি। তাই যদিও তিনি লিখেছেন '... এ মৃতের গল্প''... তবু রাতের আঁধারে জাগা প্যাঁচা, মশারির বাইরে বেঁচে থাকা নগণ্য মশা, রক্তপুঁজের ময়লা থেকে রৌদ্রে উড়ে যাওয়া মাছি, এমন কি গলিত ব্যাঙের হয়ত বা মাত্র দু'দণ্ডের জন্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা... এদের কথা বলে কবি প্রশ্ন করছেন যে ডালে সে ঝুলেছিল, সেই 'অশ্বত্থের শাখা করেনি কি প্রতিবাদ?'

জীবনের প্রতি 'অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগ' যে কবির হৃদয়ে, তিনি যেন থুরথুরে অন্ধ পেঁচার গলায় অশ্বত্থের ডালে বসে বলেন : বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে? চমৎকার! ধরা যাক্ দু-একটা ইঁদুর এবার।'' আর ঠিক এখানেই জীবনানন্দের ওপর লাগানো তকমাটি নস্যাৎ হয়ে যায় কারণ 'আবার আসিব ফিরে'র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা কবি লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকা লোকটির

সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনায় চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বলেন তিনিও একদিন তার মতোই বুড়ো হবেন, কিন্তু এই পৃথিবীর গণ্ডি পেরোনোর আগেই 'জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'কে শূন্য করে অর্থাৎ যাবতীয় স্বাদ আহ্লাদ আনন্দ দিয়ে জীবনের প্রাপ্তির ঝুলিকে ভরে নিয়ে তবে যাবেন। তিনি জানেন মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু সময়ের আগেই ওই লোকটির মতো তিনি চলে যাবেন না, এমনকি তাঁকেও কোনো 'বিপন্ন বিস্ময়'য়ের 'বোধ' ক্লান্ত করলেও নয়। তাঁর অনুজ কবিও তো ভেবেছিলেন: "যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?"

২

আসলে জীবনানন্দ হয়ত সচেতন ভাবেই তাঁর ওপর প্রোথিত তকমাটিকে সরিয়ে অন্য কিছু লেখার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো আগের কবিতাদুটিতে মনের অবচেতনের যে অভিপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই... 'অন্য' কিছু লেখার তাগিদে আবারও কিন্তু তিনি নিজের অবচেতনেই ডুব দিলেন। অর্থাৎ গণ্ডিবদ্ধতা থেকে বেরোতে অন্তরের গভীরে ডুব দিয়ে তুলে আনলেন তাঁর মগ্নচৈতন্যকে, পরাবাস্তবতার আধারে তৈরি হলো 'বিড়াল' ও 'ঘোড়া'কবিতা।

সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গো ঘুরে ফিরে লেখকের দেখা হয়ে যায়। মাছের কাঁটা কুড়িয়ে খেয়ে সে গাছের ছায়ায়, বাদামী পাতার ভিড়ে মৌচাকের মৌমাছির মতো নিজের হৃদয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকে। আবার কখনো বিড়ালটি কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়ে নখ দিয়ে আঁচড়ায়, তারপর জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে থাবা বুলোয়, সবশেষে সাদা থাবা দিয়ে অন্ধকারের বল লুফে নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। পরাবাস্তবতার ব্যাখ্যানে কৃষ্ণচূড়া যদি হয় নারীত্বের প্রতীক আর সূর্য পৌরুষের, তাহলে নখ আঁচড়ানোর অর্থ মগ্নচৈতন্যের সংরাগবাসনা আর সূর্যের গায়ে হাত বোলানো পৌরুষ শক্তির বাসনা পরিবর্ধন এবং দুয়ে মিলে যে পরিতৃপ্তির অনুভব, তার প্রতীক বেড়ালটার মৌচাকের মতো হৃদয়ে বুঁদ হয়ে থাকা। সবটাই ব্যক্ত হয়েছে যে বিড়ালের মাধ্যমে সে একই সঙ্গো আদর ও লোভের প্রতীক। তাহলে বিড়ালটা হয়ত বা কবিরই অবচেতন অভীপ্সার প্রতীক, নিজের যে আকাঙ্খাগুলোকে তিনি মনের গহনে লুকিয়ে রাখতে চান, বেড়ালটার অন্ধকারের বল পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে তার সংকেত।

'ঘোড়া' কবিতায় প্রান্তরে চরা প্রাণীগুলিকে প্রস্তরযুগের বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় যুগযুগান্তরের স্মৃতি যা মানুষের সামূহিক নির্জ্ঞানে (collective unconscious) সঞ্চিত থাকে, যার প্রতীক এই কবিতায় উল্লেখিত প্রান্তরের জ্যোৎস্নামাখা ঘাস। ঘোড়াগুলো যে 'মহীনে'র, তিনি হলেন মহীন্দ্র, পৃথিবীর অধিপতি, তথা কবি স্বয়ং। ঠিক আগের কবিতাটির মতোই ঘোড়াগুলো আবার কবির মগ্নচৈতন্যে প্রস্তরীভূত হয়ে থাকা অবদমিত বাসনার স্মৃতিও, যা আজো অবিনষ্ট,তাই ঘোড়াগুলো 'এখনো ঘাসের লোভে চরে'। এই সূত্রে পাঠকের মনে পড়বে জীবনানন্দের 'ঘাস' নামের কবিতাটির কথা, যাতে অদ্ভুত এক ইন্দ্রিয়-সংশ্লেষ (synesthesia) ঘটিয়ে হরিৎ-ঘাসের ঘ্রাণ মদের মতো গ্লাসে পান করতে বলেছিলেন তিনি। কিন্তু সভ্য সমাজ (এই কবিতায় যার প্রতীক "কিমাকার ডায়নামো") সেই প্রস্তর যুগের বাসনাকে তুষ্ট হবার সুযোগ তো দেয় না, তাই স্রেফ স্বপ্নে কি অবচেতনে আবারও বেড়ালের রূপকেই সেসব অনুভবের অভিপ্রকাশ হয়। লক্ষণীয় এখানেও সোহাগ ও লোভের প্রতীক হিসেবে বেড়ালটা এসেছে। তাই দুটি কবিতাতেই পরাবাস্তব কী আপাত অসংলগ্ন ভাবনার আড়ালে কবি বস্তুত নিজের অবচেতন তথা মগ্নচৈতন্যকেই মেলে ধরেছেন অকপটে, অবদমিত আকাঙ্খা প্রকাশের জন্যে।

৩

সবশেষে ১৯৪৬-৪৭ কবিতার আলোচনা। সুবৃহৎ এই কবিতাটির শিরোনাম ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক রক্তক্ষয়ী পালাবদলের ইঙ্গিত দেয়। ২০০ বছরেরও বেশি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সেই সময় মুক্ত হচ্ছে দেশ। একদিকে সে ভারি আনন্দের সময়, কিন্তু রোম্যান্টিক না হয়ে একটু তলিয়ে ভাবলেই সেই অনুভব উবে গিয়ে দেশটার খণ্ডিত হয়ে যাওয়া, স্বাধীনতার আগে ও পরে ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মৃত্যু মিছিল, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং খণ্ডিত ও নতুন দুটি দেশেরই সাধারণ মানুষদের সার্বিক সর্বনাশের কথা বেশি মনে পড়ে। সেই 'পার্টিশন' পৃথিবীর ইতিহাসে এতোটাই অভিঘাত ফেলেছিল যে Partition Studies নতুন একটি গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই কবিতার শিরোনামে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, কবিতার অন্তর্গত উপাদান তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত, যা শাশ্বত কিন্তু মর্মান্তিক কিছু সত্যের কথা বলে। কবিতাটি শুরু হয় কোনো এক ব্যস্ত শহরে যেখানে সবাই ছুটছে ফুটপাথে, কী ট্রাকে কী ট্রামে, কেননা সকলেই সকলকে হারিয়ে দিয়ে আগে 'স্বর্গে' পৌঁছোতে চায়, যে স্বর্গে নিলাম হয় ঘরবাড়ি, কিন্তু হাতে গোণা কয়েকজনই সেসব কিনতে পারে বহুকে বঞ্চিত করে। 'কবিতার কথা' গ্রন্থে জীবনানন্দ লিখেছিলেন:

'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার'। সেই বোধ তাঁকেও সমকাল ও বাস্তবের কঠিন জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল। সমাজের ওপরতলার মানুষদের অত্যাচারে অসহায় সাধারণ মানুষের অপমানের কথা তিনি ক্ষুব্ধতার সঙ্গো প্রকাশ করেছেন 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা'র নানা কবিতায়।

আলোচ্য কবিতাতেও সুদ, হুন্ডি এমন শব্দের প্রয়োগে এই জগৎটা যে আসলে ব্যবসার আড়ত, এমন ভাবই ব্যক্ত করে কবি লিখছেন একপেশে এক সমাজের কথা যেখানে 'উঁচু' তলার লোকেরা (অর্থাৎ ক্ষমতাবানরা) 'সব' নিয়ে নেয়, নাকি দখল করে নেয়? এমনকী নারীকেও নেয়: এই সমাজে নারীও যে অন্যতম পণ্য, এই সোচ্চার সাহসী উচ্চারণ করা লেখককে নিছক বেদনার কবি আখ্যা দেওয়া যায় না। মনে পড়বে এই কবিই তো "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" কবিতায় বেহুলাকে ছিন্ন খঞ্জনার সঙ্গো তুলনা করেছেন। স্বর্গে গিয়ে স্বামীর প্রাণ ফিরে পাবার জন্য বেহুলাকে যখন দেবতাদের (নাকি ক্ষমতাসীন মানুষদের?) সামনে নৃত্য প্রদর্শন করতে হয়েছিল, তখন যেন সেই অবমাননার মুহূর্তে তার পায়ের ঘুঙুরের সঙ্গো জড়িয়ে গিয়ে বাংলার মাঠ ঘাট ভাঁট ফুলও তার বেদনাকে ভাগ করে নিয়েছিল। তাই এই কবিতাতেও সমাজের বৃহত্তম সংখ্যার সাধারণ মানুষরাও তাঁর চোখে হেমন্তের হলদে হয়ে যাওয়া মৃত পাতার মতো, যারা কেউ হয়ত হাওয়ার উড়ে যায়। আবার কেউ বা ঝরে পড়ে মাটিতে মিশে নতুন বীজের মধ্যে দিয়ে আরো একবার বেঁচে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় থাকে।

আর আশ্চর্য যে পৃথিবীতে অনেক জন্ম নষ্ট হয়ে গেছে জেনেও তারা আবার সূর্যের গন্ধে, ঘাস, ফুল কিংবা জলের মধ্যে অমরত্ব পেতে চায়।

আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গো লড়াই করা কবিও জানতেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে দু-একজন হুন্ডিওয়ালা বহুকে বঞ্চিত করে জীবনের সকলের সব প্রাপ্যকে দখল করে নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কীভাবে বাংলার কৃষকদের জীবনে সর্বনাশ ঘটিয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন। যারা একদা নবান্ন উৎসবে মাতোয়ারা হতো, আজ মানুষেরই তৈরি মন্বন্তরে সেই লক্ষ লক্ষ মানুষগুলোর অসহায় মৃত্যুতে কবির বেদনা ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায়। সমাজে যে বিভাজন তৈরি হয়েছে ক্ষমতা ও অর্থের অসম বণ্টনে, সেখানে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি হয়েছে বিশ্বাসের। তাই কবি লিখছেন আজ 'সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে' যা আজো বড়ো প্রাসঙ্গিক।

এরপরেই এসেছে আশ্চর্য কিছু পংক্তি যখন জীবনানন্দ লিখছেন: 'পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু হৃদয়ে কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে বধ ক'রে ঘুমাতেছি'। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের আদম-ইভের দুই সন্তান কেইন ও আবেলের কাহিনিতে জানা যায় ভ্রাতৃঘাতক যে পৃথিবীর প্রথম হত্যাকারী, সেই পরম সত্যের কথা। জীবনানন্দের লেখা ওই পংক্তিগুলিতেও যেন তারই অনুরণন। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই জীবন ও মৃত্যু একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর মানুষের মধ্যেই যে জান্তব জিঘাংসা থাকে, যা তাকে খুনি করে তোলে হয়ত তার ভাইয়ের জীবনেও, সেই মর্মান্তিক সত্যটিই ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতার 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়... দ্বেষ' এই পংক্তিটিতে।

এই সূত্রেই কবিতার নামকরণটির তাৎপর্য নতুনভাবে ধরা দেয় পাঠকের কাছে — ১৯৪৬-৪৭এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে হাজার হাজার মানুষ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তারা তো বিভাজনের আগে অবিভক্ত দেশটিতে ভ্রাতৃপ্রতিম জীবনই কাটিয়েছে কত শত বছর ধরে। তারপর আসে বিদেশি শাসক। শাসন করে বহুদিন। অবশেষে স্বাধীনতা দেবার নামে তারা দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গো আপোস-পরিকল্পনায় দেশটাকে দু-টুকরো করে দেয়। পাথুরেঘাটার, মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এণ্টালির ইয়াসিন, হানিফ, মহম্মদ, মকবুল করিম, আজিজ কিংবা গগন, বিপিন, শশী, যারা জাত কী ধর্ম ব্যতিরেকে প্রতিবেশী হয়ে পরস্পরের সুখ-দুঃখে জুড়ে থেকেছে, বিভাজনের রাজনীতির উসকানিতে তারাই পরস্পরকে খুন করে রক্তের ধারায় লাল হয়ে যাওয়া জলে পাশাপাশি লাশ হয়ে ভেসে যাচ্ছে। অথচ বাস্তবে এরা সকলেই সমান ছিল, সকলেই 'জীবনের ইতর শ্রেণীর মানুষ' যারা 'ছেঁড়া জুতো পায়ে বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে'। কিন্তু উঁচুতলার লোকেদের স্বার্থরক্ষায় এই উলুখাগড়ারাই হানাহানি করে মরে বা মরতে প্ররোচিত হয়।

সমাজের এই কুৎসিত ছবি এঁকে বেদনার্ত কবি লিখেছেন 'কেউ নেই, কিছু নেই... সূর্য নিভে গেছে।' তাঁর যাপনের এই সময়কালে জ্ঞান নেই, অর্থাৎ বোধ নিঃশেষিত; আর তাই প্রেমও নেই। তাই জীবনপথের এই যাত্রিকদের সামনে নেই কোনো আলোকিত পথ। কিন্তু এখানে আমরা আবারও পাই জীবনপিয়াসী জীবনানন্দকে। তাই কবিতার একেবারে শেষে দেখি জীবন বীতশোক হয়েছে, হৃদয়ের জ্বালা নিভেছে, কবিও জানতে চাইছেন বাতাসে আজো পবিত্রতা আছে কিনা? হয়ত তিনি বিশ্বাস করেন আছে, তাই অবনমন বিমুখ ভাবনায় স্থিত মানুষ নিজেদের দুর্দশার অন্ধকার থেকে আবার চলেছে গ্রামের উৎসবের দিকে, নিজেদের সব ভুল, সব পাপকে অতিক্রম করে। হয়ত আবারও একদিন তারা 'নবান্নের ঘ্রাণ' পাবে, হয়ত শত খামতির মধ্যেও নতুন প্রাণকণা হয়ে জেগে উঠবে তাদের সন্ততিরা।

শেষকথা

একথা তাই হয়ত বিশ্বাস্য যে তাঁর সব কবিতা কেবল নিরাশার কথাই বলে না। তিনি তো বারবার এই বাংলার বুকে ফিরে আসতে চেয়েছেন। অবচেতনের সংরাগকে নানা প্রতীকে যে ভাবে অকপটে ব্যক্ত করেছেন, তা জীবনের সপক্ষে তাঁর গভীর ভালবাসার উচ্চারণ। তাই বেদনাকেও তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন যে, তা বলাই বাহুল্য। আর আছে সমাজ সম্পর্কে তাঁর সুতীব্র সচেতনতা যা প্রমাণ করে নিজেকে তিনি মোটেও দুঃখের অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখেন নি। তাই ভাবের ঘরে চুরি না করে বরং সরাসরি বলা ভাল যে প্রচলিত একমাত্রিক ছাঁচে তাঁর লেখাকে ঢালা যায় না। বস্তুত তাঁর কবিতার ভাবনা ও বিষয় ব্যাপৃত হয়ে আছে নানান বিপ্রতীপ উপাদানের মধ্যে। ১২৫তম বর্ষে তাই অন্যভাবে জীবনানন্দের মূল্যায়ন জরুরি, নইলে আনন্দময় জীবনের নামধারী এই কবির প্রতি উত্তর প্রজন্মের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মিথ্যে হয়ে যাবে।

লেখক পরিচিতি : চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপিকা, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ